করোনা পরিস্থিতি - কেমন আছে সরকারি স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা ?

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০

সুনন্দা ভট্টাচার্য, শিক্ষিকা

রাত সাড়ে বারোটা। বেজে উঠল ফোন। চমকে উঠে কি না কি ভেবে কলটা রিসিভ করতে গিয়ে দেখি জড়ানো গলায় কেউ জিজ্ঞেস করছে, "কে বলছেন আপনি? ফোন করেছিলেন কেন? "নাম্বারটা তো আমার এক ছাত্রের, তবে ইনি কে? বোঝা গেল ইনি আমার এইট এর ছাত্র প্রীতমের বাবা। অনেক কষ্টে ছাত্রটির ফোন নাম্বার জোগাড় করেছি। দুপুরের দিকে কিছু প্রশ্ন দেবার জন্য ফোন করেছিলাম, মদ মাতাল বাবা রাত বারোটায় বাড়ি ফিরে আমাকে কল ব্যাক করেছে, কি পরিস্থিতি! হাসি পেয়ে গেল আমার। কারো ফোন থাকে মায়ের কাছে, কারো বাবার কাছে, কারো বা কোন দূর সম্পর্কের আত্মীয় বা বাড়ির মালিকের কাছে। হ্যাঁ আমি যে ছাত্রদের পড়াই, তারা সারাক্ষন কোলে ল্যাপটপ আর কানে মোবাইল নিয়ে ঘোরে না, এর তার কাছে একটা মোবাইল দেখলে সেটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করে, ফোন নাম্বার চাইলে সেই আত্মীয়র ই ফোন নাম্বার দেয়। সেই ফোন নাম্বার নিয়ে আমরা সরকারি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করি, ভিডিও তৈরি করে পড়াশুনো করাবার চেষ্টা করি, কিন্তু সেই গুলো আদৌ তাদের কাছে পৌঁছায় কিনা জানিনা। বখাটে ছেলের দল লম্বা ছুটি পেয়ে পড়াশোনাটাই ভুলতে বসেছে, কেউ পড়তে বসতে বলে না, আহা কি মজা, দশটার সময় ঘুম থেকে উঠে, কিছু একটা মুখে গুঁজে সারাদিন গেছোমি করে বেড়ায় তারা। অনেক মা লোকের বাড়ি কাজ করে গভীর রাতে বাড়ি ফেরেন, মদ মাতাল বাবা গালাগাল দিতে দিতে বাড়ি ঢুকে কোনক্রমে শুয়ে পড়েন। ছেলের দিদিমণি মাস্টারমশাই আজ কি ভিডিও পাঠালেন এই নিয়ে তার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। ছেলেকে বা মেয়েকে বলার ও প্রয়োজন মনে করেন না। অনলাইন ক্লাসের নামে সরকারি স্কুলের ছাত্রদের এই দায়সারা শিক্ষা দিয়ে আমাদের ক্ষান্ত থাকতে হয়।

কেমন আছে ওরা আমাদের ছাত্ররা, এই কোভিড পরিস্থিতিতে? অনেকেরই বাপ-মায়ের চালচুলোহীন সংসার, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, স্কুল চললে মিড-ডে-মিল টুকু পাওয়া যেত, এখন সে গুড়ে বালি। নির্দিষ্ট দিনে স্কুলে হাজিরা দিতে পারলে, বাবা মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে চাল, আলু, সাবান, মাস্ক, মটর। হাজিরা দিতে না পারলে জুটবে না তাও। অভাবের সংসারে মিড ডে মিলের চাল আলুই ভরসা। একজনের খোরাক ভাগ করে খেতে হয় তিন জনকে। আদৌ পেট ভরে? পড়াশোনা! স্কুলের দিদিমণি খুব বকতেন বটে, তবু খুব ভালো লাগতো আকাশের স্কুলে যেতে। ইংরেজি দিদিমণি পড়াতে পড়াতে প্রশ্ন করতেন, আকাশের কমনসেন্স খুব ভালো আর তাই আকাশ অনেক প্রশ্নের উত্তর অনায়াসেই দিতে পারত ক্লাসে। দিদিমণি পিঠ চাপড়ে দিতেন, যেটা ভুল হতো সেটা বলে দিতেন। রাশি রাশি নম্বর পায়না আকাশ, তবু স্কুলের সেই দিনগুলো বড্ড ভালো লাগতো তার। বন্ধুদের সঙ্গে খুনসুটি, পড়াশোনার ফাঁকে নানান গল্প, আর কোন কোন বিষয়ের ক্লাসে অনেক রকম কিছু শিখতে পারতো আকাশ। আজ ছ' মাস হতে চলল সব বন্ধ, সব, এমনকি রবীন্দ্রজয়ন্তী বা শিক্ষক দিবসে গান গাইতে পারেনি আকাশ, বুকের ভেতর কষ্ট গুলো দলা পাকিয়ে আসে। কাকে বলবে? আকাশের বাবা নেই। সে যখন খুব ছোট তখন নাকি আকাশকে আর তার মাকে ছেড়ে বাবা কোথায় পালিয়েছে, খোঁজ নেই তার। মা লোকাল ট্রেনে করে অনেক লোকের বাড়ি কাজ করতে যেত এখন ট্রেন চলাচল বন্ধ। কোনোক্রমে কাছেপিঠে দুটো কাজ জোগাড় করেছে মা। খুচরো কাজ করে কোনোমতে সংসার চলে। তবু আকাশের পড়াশোনা নিয়ে খুব চিন্তা মায়ের, ছেলেটা যা হোক কিছু শিখছিল, মাস্টারমশাই দিদিমণিরা আদর করে হোক, চোখ রাঙিয়ে হোক অনেক কিছু শেখাচ্ছিলেন, এখন সব বন্ধ। ছেলেটা সারাদিন রাস্তাঘাটে ঘুরে

বেড়ায়, আড্ডা দিয়ে বেড়ায় অনেকের সঙ্গে মেশে, তারা কারা, মা জানেনও না। এসব খবর নেবার সময় কই তার? পড়াশোনা করতে বললে মাঝে মাঝে বই নিয়ে বসে বটে, তবে কি পড়ছে তা বোঝার ক্ষমতা মায়ের নেই। ছেলেটার বোধহয় আর পড়াশোনা হল না, দুশ্চিন্তায় দু'চোখের পাতা এক করতে পারেন না মা। শুভজিৎ পড়াশোনায় বড্ড ভালো ছোটবেলা থেকেই, মা যাদের বাড়ি থেকে কাজ করতেন, সেই দাদুই স্কুলে ভর্তি করেছিলেন, বই কিনে দিতেন দাদু, নানান স্বাদের বই, দাদুর কাছে অনেক শিখেছে শুভজিৎ। দাদু এখন নেই, স্কুলে দিদিমণি পড়াতে পড়াতে অনেক কিছু শেখাতেন, বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল শুভজিৎ, কিন্তু এখন যে সব ভুলতে বসেছে! তার মায়ের কাছে এনড্রয়েড ফোন নেই,ছোট্ট ফিচার ফোনে ফোন করে করে কিছু পড়া জেনে নেয় শুভজিৎ। স্কুলের মাস্টারমশাই দিদিমনিরা নাকি ভিডিও করে পড়াচ্ছেন, কেউবা অনলাইনে ক্লাস করাচ্ছেন, শুভজিৎ তার কোন হদিস পায় না, ওর কাছে ফোন নেই, ইন্টারনেট কানেকশন নেই। এই অবস্থা থেকে উত্তরণ কি আদৌ সম্ভব? নানান প্রশ্ন জাগে শুভজিতের মনে, কবে আবার সব স্বাভাবিক হবে? আগের মত পড়াশোনা কি আর সম্ভব হবে? মাঝে মাঝে অর্কর সঙ্গে কথা বলে শুভজিৎ। অর্ক ওদের ক্লাসে ফার্স্ট হয়। অর্ক সেদিন বলছিল, কোন একটা অ্যাপ নিলে তারা নাকি একটা করে ট্যাবলেট দেবে, রোজ রোজ সব বিষয় দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে শিক্ষকরা পড়াবেন, হোমওয়ার্ক দেবেন কারেকশন করবেন, কিন্তু অর্ক বুঝতে পারছেনা এ ধরনের অ্যাপ এর উপর বিশ্বাস করা বা এই অ্যাপটা নেওয়া উচিত কিনা। মহুয়া ম্যাডাম বারণ করেছেন। বহুকষ্টে পাঁচহাজার টাকা জমিয়ে ছিল অর্ক, সেই টাকাটা দিয়ে একটা অ্যাপ নিলে কিছুটা কি পড়াশুনা নিয়ে এগোনো যাবে? অর্কর মনে নানান প্রশ্ন। কাকে জিজ্ঞেস করবে? কে জানে উত্তর?

মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসে নানান খবর, সব বদলে যেতে চলেছে, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কি আর থাকবে না! এত কিছু ভাবলে মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করে অর্কর। ভেবেছিল খুব ভালো করে পড়াশোনা করে ডাক্তার হবে, মা বাবাকে নিয়ে আনন্দে বাঁচবে, সেটা কি আর হবে না? জীবন বিজ্ঞান পড়তে পড়তে, অনেক জায়গায় হোঁচট খায় অর্ক। প্রবীর স্যার থাকলে ঠিক বুঝিয়ে দিতেন, ফোনটা বাবার কাছে থাকে, বাবা যখন বাড়ি ফেরেন অনেক রাত, প্রবীর স্যারকে ফোন করা হয় না, কখনো কখনো ফোন করলেও সাড়া মেলে না স্যারের, মনে অনেক প্রশ্ন নিয়ে রাতের অন্ধকারে একা একা কাঁদে অর্ক। রাস্তার মোড়ে যে বড় দোতলা বাড়িটা আছে, সেই বাড়িটার বারান্দায় ল্যাপটপ নিয়ে বসে থাকতে দেখা যায় বছর বারোর একটি মেয়েকে। অর্ক মনে মনে ভাবে, আহা এমন সৌভাগ্য যদি তার হত! এক ঝটকায় পাল্টে গেল রোজকার জীবনটা। বিজ্ঞান স্যার সাইন্স এক্সিবিশনএ নিয়ে যেতেন। প্রতিবছর প্রাইজ পায় অর্ক। মডেলটা ও তৈরি করেছিল এবার, যাওয়া আর হোলোনা, কত নতুন ভাবনা নিয়ে কত ছাত্রছাত্রীরা আসে, কতকিছু জানা যায়, এবার কিছু হলো না।অর্কর জীবনে আনন্দ তাই যেন উবে গেছে। প্রতিবছর নাটক প্রতিযোগিতায় যোগদান করে স্কুলের ছেলেরা, প্রায় প্রতি বছরই প্রাইজ পায়, এবছর কিছু নেই, নাটক প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান মেলা, দাবা প্রতিযোগিতা, কিচ্ছু না। মাঝে মাঝে মাস্টারমশাই দিদিমণিদের পাঠানো ভিডিও দেখে অর্ক ও তার বন্ধুরা। এ যেন দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো, কত প্রশ্ন থেকে যায় মনে। হোমওয়ার্ক মেলে, ঠিকমতো করতে না পারলে সাহায্য করার কেউ নেই, সত্যি কি পড়াশোনা এগোচ্ছে? সময়টা যেন থেমে গেছে, এবার যদি স্কুল খোলে ও, আগের মত পড়াশোনায় মন বসাতে পারবে তো অর্ক? সে নিজেই জানে না। সুকান্ত বলছিল আস্তে আস্তে যেন সব ভুলে যাচ্ছে, যা শিখেছিলো সেসব ও। সবাইকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার যে কর্মযজ্ঞ ভারতবর্ষে শুরু হয়েছিল, করোনা নামক দানব এক মুহূর্তে লন্ডভন্ড করে দিলো সেই যজ্ঞ। এখন সামনে শুধু অনিশ্চয়তা। ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগররা ও চুপ, তারা নিজেই বোধহয় জানেন না কি করা উচিত? এই অবস্থা বেশি দিন চললে, ছাত্র-ছাত্রীদের মননের ওপর যে প্রভাব পড়বে, সেই অপূরণীয় ক্ষতি, এক জীবনে পূরণ হবে কিনা জানা নেই। জ্ঞানযজ্ঞে অংশীদার হবার জন্য মুখিয়ে থাকা বিরাট সংখ্যক সরকারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এ বড় কঠিন সময়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণ হয়তো কিছুটা সম্ভব হতো, যদি সমাজের সমস্ত ক্ষেত্র থেকে ব্যক্তি মানুষরা এগিয়ে এসে, কাছাকাছি থাকা ছাত্রদের শিক্ষাদানে ব্রতী হতেন। করোনা আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে, এই দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে উত্তরণের রাস্তাও করোনাই শেখাবে, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে, এই সময় শিক্ষকদের দায়িত্ব বিরাট, ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যম বাঁচিয়ে রাখতে তাদের অগ্রণী ভূমিকার কথা শিক্ষক কুলকে মনে রাখতেই হবে এই সময়। আশার আলো দেখা যাচ্ছে, হয়তোবা অচিরেই খুলবে বিদ্যালয়, কে বলতে পারে আবার হয়তো আগের মতোই ছন্দে ফিরবে সব। কোভিড পরবর্তী পঠন-পাঠন আর বিদ্যালয়ের পরিবেশ আরো ভালো ও হতে পারে। কোভিড ছাত্র-ছাত্রীদের শিখিয়েছে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব, এই বা কম কি?

মানুষ বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে বার করেছে যুগে যুগে এবারও তাই হবে, শুধু সময়ের অপেক্ষা। পৃথিবীর সব ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো থাকুক আনন্দে থাকুক, সেটা নিশ্চিত করাই এখন শিক্ষক ও অভিভাবকদের গুরুদায়িত্ব।

(C) Ishan Kotha